# ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

**সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, চেয়ারম্যান, ফিনএক্সেল ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড**

## ভূমিকা:

বেশ কয়েক বছর থেকেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে চলেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম বাধা। এ নিয়ে জনমনে তৈরি হয়েছে আস্থাহীনতা ও উৎকণ্ঠা। নিকট অতীতে পুঁজিবাজার, হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, বেসিক ব্যাংক ও ডেসটিনি কেলেঙ্কারি সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা চুরির ঘটনা। ভবিষ্যতে এ সকল ঘটনা উত্তরণে এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে প্রয়োজন সমস্যাগুলো উত্তরণে করণীয় নির্ধারণ করা।

## ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ:

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এরমধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো হলো:

১. বিনিয়োগ না বাড়ায় ব্যাংকগুলোতে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত পড়ে থাকা।
২. ব্যাংকগুলো যে ঋণ দিচ্ছে তা আদায় করতে না পারা, কিংবা কাকে ঋণ দেয়া হবে তা নিয়ে সংকট তৈরি হওয়া। দেখা যাচ্ছে, ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বারবার ঋণ দিচ্ছে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেন হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে জোর করে ঋণ দেয়া হচ্ছে।
৩. ব্যাংকিং খাতের নানা অনিয়ম ও জালিয়াতি।
৪. ব্যাংকগুলোর কেবল লাভের পেছনে ছোটা। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকগুলো অর্থ দিচ্ছে না এবং ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ঠিকমতো জামানত দেখছে না। এভাবে ঋণ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আর টাকা আদায় করতে না পেরে লোকসানের মুখ দেখছে। এরফলে ব্যাংকগুলো লাভ করতে না পারায় রাজস্ব আদায় কম হচ্ছে।
৫. বিপুল অঙ্কের খেলাপি ও মন্দ ঋণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে।
৬. ব্যাংকগুলোর আইটি সিস্টেম সুরক্ষিত না থাকা। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়ায় নতুন করে ব্যাংকিং খাতের আইটি/প্রযুক্তির বিষয়টি আলোচনায় চলে এসেছে।
৭. মূলধন ঘাটতি, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে।
৮. আমানত সংগ্রহে অসম প্রতিযোগিতা।
৯. ব্যবস্থাপনার সংকট, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর।
১০. সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতে পরিচালকদের অযাচিত হস্তক্ষেপ।
১১. বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে সিবিএ নেতাদের দৌরাত্ম্য।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত মূলত আমানত নির্ভর। বড় ধরনের অর্থায়নে বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট থাকায় এখানে ঋণপ্রবাহ কম। আর যেটুকু ঋণ দেয়া হয়, তার বড় অংশই নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামষ্টিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক পরিবেশে ঋণ প্রবৃদ্ধিও কম এ খাতে। এসব কিছু বিবেচনায় ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল (উইক প্লাস) মনে করে আন্তর্জাতিক ঋণমান সংস্থা মুডি'স। সম্প্রতি সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকির মধ্যে অন্যতম হলো ঋণ নিবিড়তা। মূলত এ ঋণের সিংহভাগ রয়েছে করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। ব্যাংকগুলোও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে (*বণিকবার্তা*, ০৬ এপ্রিল ২০১৬)।

## ব্যাংকিং খাতে অনিয়মের কিছু চিত্র:

গত দেড় দশকে ব্যাংকিং খাতে নয়টি বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে। আর গত সাত বছরে ঘটা ছয়টি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি চুরি বা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বড় এসব আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ। কিন্তু একটি কেলেঙ্কারিরও বিচার হয়নি। উল্লেখযোগ্য কারো শাস্তি হয়নি এখনও (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)।

### ১. রিজার্ভের টাকা লোপাট

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে সংরক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সম-পরিমাণ ডলার চুরির ঘটনা ঘটে। এ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার অ্যাকাউন্ট থেকে শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনের ব্যাংকিং চ্যানেলে স্থানান্তর করে হ্যাকাররা। পরবর্তীতে সেখান থেকে এই অর্থ অন্য জায়গায় পাচার করা হয়। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ লোপাট 'হ্যাকিং নয়, বরং চুরি' বলেই অনেক বিশ্লেষকের ধারণা।

অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মতে, এই ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা শতভাগ জড়িত। তাঁর মতে, স্থানীয়দের সহযোগিতা ছাড়া এটা হতেই পারে না। ছয়জন লোকের হাতের ছাপ ও বায়োমেট্রিকস ফেডারেল রিজার্ভে আছে। নিয়ম হলো, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়–এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্লেটে হাত রাখার পর লেনদেনের আদেশ কার্যকর হতে হয় (*প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ ২০১৬)।

আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন-এর মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরের যুক্ততা ছাড়া হ্যাকিং সহজ নয়। তিনি মনে করেন, রিজার্ভ নিয়ে যারা কাজ করেন তারা সর্বোচ্চ সততা ও দেশপ্রেমসম্পন্ন হন। এতদসত্ত্বেও কোনো রকম ঝুঁকির সুযোগ না রাখতে রিজার্ভ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরও নজরদারিতে রাখতে হয়। তাঁর মতে, যা হয়েছে তা অমার্জনীয় অপরাধ (*প্রথম আলো*, ১১ মার্চ ২০১৬)।

প্রসঙ্গত, রিজার্ভের অর্থ লোপাটের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক এক মাসের বেশি সময় গোপন রাখে। ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা তৈরি হয়। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতোমধ্যে রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের জনগণের ঘাম ও রক্ত। একইসঙ্গে আমরা জানি যে, একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং রিজার্ভের অর্থ তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে টাকা লোপাট হওয়ার ঘটনা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে। এমন পরিস্থিতিতে চারটি জরুরি করণীয় রয়েছে বলে আমরা মনে করি: ১. অর্থ উদ্ধার; ২. চুরির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ; ৩. দোষীদের শাস্তি প্রদান; এবং ৪. সুরক্ষিত আইটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির বিষয়ে ৪ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের কাছে একটি গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮০০ কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা হ্যাকিং বা ম্যালওয়ার নয়, ডিজিটাল ডাকাতি। বিদেশ থেকে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নয়, ব্যাংকের অভ্যন্তরে স্থাপিত সুইফটনেট কম্পিউটারের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে রিজার্ভের অর্থ লোপাট করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যোগসাজশ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজড পারসন বা সুইফট সিস্টেমের পাসওয়ার্ড ব্যবহারকারী কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেই রিজার্ভ চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধুমাত্র গভর্নরের পদত্যাগই এই সমস্যার সমাধান নয়। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন (*ইত্তেফাক*, ০৫ এপ্রিল ২০১৬)।

## ২. বেসিক ব্যাংক

আইন ও বিধিমালার তোয়াক্কা না করেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ইচ্ছামতো ঋণ দেয়া হয়। এমনকি প্রধান কার্যালয়ের ঋণ যাচাই কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও পর্ষদ অনুমোদন দেয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মাত্র ১১টি পর্ষদ সভায়ই ৩ হাজার ৪৯৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এভাবে অনিয়ম করে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার মতো ভুয়া ঋণ সৃষ্টি করে তা হাতিয়ে নেয়া হয়।

অভিযোগ রয়েছে, বেসিক ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই (বাচ্চু) নিজের একক প্রভাবে এসব ঋণ দিতে বাধ্য করেছেন। অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান, অপ্রতুল জামানতের বিপরীতে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে মতিঝিল, শান্তিনগর ও গুলশান শাখা থেকেই সিংহভাগ ঋণ দেয়া হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই ব্যাংকের এমডি কাজী ফখরুল ইসলামকে অপসারণ করা হয়। চাপের মুখে চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চু পদত্যাগ করেন (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বাচ্চুকে দায়মুক্তি দিয়েছে। বাচ্চুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা এমন এক প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি *প্রথম আলো*'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার সব আলাপ করা যায় না।' অর্থাৎ রাজনীতির দোহাই দিয়ে অদৃশ্য শক্তির বলে পার পেয়ে যাচ্ছেন বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান।

## ৩. হলমার্ক

ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিটি ঘটেছে ২০১২ সালে। তৈরি পোশাক খাতের হলমার্ক নামের একটি স্বল্প পরিচিত গ্রুপ সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখা থেকে রপ্তানির ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে নানা কারসাজি করে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বের করে নেয়। এর মধ্যে হলমার্ক গ্রুপ ও এর ভুয়া সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো নেয় ৩ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা। হলমার্কের অস্তিত্বহীন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে স্থানীয় এলসি (ঋণপত্র) খুলে টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়া ওই সময়ে আরও কয়েকটি কোম্পানি আরও ১ হাজার কোটি টাকা একইভাবে জালিয়াতি করে ওই ব্যাংকের শাখা থেকে তুলে নেয়। পরে সেগুলো হলমার্কের মালিকের স্বজনদের প্রতিষ্ঠান বলে জানা যায়।

এ ঘটনার পর ওই বছরের অক্টোবর মাসে হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ ও চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোনালী ব্যাংকের ওই শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্তের ভিত্তিতে মামলা করে। সেই মামলার রায় এখনো হয়নি। এছাড়া ২০১২ সালেই অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির তৎকালীন সভাপতি আ হ ম মুস্তফা কামালের কাছে প্রতিবেদন জমাও দেয়া হয়। কিন্তু সেই প্রতিবেদন আর প্রকাশ করা হয়নি (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ, ২০১৬)।

## ৪. বিসমিল্লাহ গ্রুপ

২০১১ ও ২০১২ সালে টেরিটাওয়েল (তোয়ালে জাতীয় পণ্য) উৎপাদক বিসমিল্লাহ গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের পাঁচটি ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে প্রায় ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পরিদর্শনে এ চিত্র উঠে আসে।

ভুয়া রপ্তানি দেখানো, বিদেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার মাধ্যমে অতি মূল্যায়ন করে বাংলাদেশ থেকে আমদানি এবং এর মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে সরকারের দেয়া নগদ সহায়তা তুলে নেয় বিসমিল্লাহ গ্রুপ। এর পাশাপাশি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের খোলা স্থানীয় এলসি (ঋণপত্র) দিয়ে আরেক (এটাও নিজস্ব) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নিয়ে বিল তৈরি করে (অ্যাকোমুডেশন বিল) তা ব্যাংকে জমার মাধ্যমে অর্থ বের করে নেয়া হয়। যেসব ব্যাংক থেকে অর্থ নেয়া হয়েছে, এর মধ্যে জনতা ব্যাংকের ৩৯২ কোটি টাকা, প্রাইম ব্যাংকের ৩০৬ কোটি, যমুনা ব্যাংকের ১৬ কোটি, শাহজালাল ব্যাংকের ১৪৮ কোটি এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৬২ কোটি টাকা। এ ঘটনায় এসব ব্যাংকের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হন। আর বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী ও চেয়ারম্যান নওরীন হাসিব তখন দেশ থেকে পালিয়ে যান (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)।

### ৫. পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারি

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরের বছর দেশে দ্বিতীয়বারের মতো পুঁজিবাজারে ব্যাপক ধ্বস নামে। ওই কেলেঙ্কারিতে অন্তত ১৫ হাজার কোটি টাকা খুইয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। ধক্ষসের আগে ব্যাংকগুলো অধিক মাত্রায় শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে, যা রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারির ঘটনায় সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি তাদের প্রতিবেদনে অনিয়ম ও অপরাধের বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরলেও মামলা হয় মাত্র দুটি। বাকি ঘটনাগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো সুরাহা হয়নি। অথচ ওই সব অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিএসইসিকে। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলোর বিষয়ে বিএসইসি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

দেখা গেছে, অনিয়মের কোনো বিচার না হওয়ায় পুঁজিবাজারের ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা নেই। তাই এই বাজার দীর্ঘকালীন এক মন্দাবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)। ঢাকা স্টক অ্যাক্সচেঞ্জ-ডিএসই'র তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালের ৫ ডিসেম্বর ডিএসই'র সাধারণ সূচক ছিল ৮,৯১৮ পয়েন্ট। আর ওই দিন লেনদেন হয় ৩ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ ১১ এপ্রিল ২০১৬ ডিএসই'র সাধারণ সূচক দাঁড়ায় ৪,৪২৬ এ। এদিন লেনদেন হয় মাত্র ৪৬৩ কোটি ৭০ লাখ টাকার শেয়ার। এক তথ্যমতে, ২০১০ সালের ৫ ডিসেম্বর ডিএসই'র বাজার মূলধন ছিল ৩ লাখ ৬৮ হাজার কোটি... টাকা। ওই বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ছিল ২২৮টি। এরপর বাজারে ৫৮টি কোম্পানি যুক্ত হলেও বর্তমানে ডিএসইর বাজার মূলধন নেমে এসেছে ৩ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকায় (*যুগান্তর*, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫)।

লেনদেন কমে যাওয়ায় পুঁজিবাজার থেকে কমেছে সরকারের রাজস্ব আদায়। অন্যদিকে বিনিয়োগ আয়ের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য আয় ছিল পুঁজিবাজার থেকে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসত ব্রোকারেজ হাউজ ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং থেকে। কিন্তু ২০১০ সালের পর থেকে পুঁজিবাজারে অব্যাহত দরপতনের কারণে এখন অনেক প্রতিষ্ঠানের ব্রোকার হাউজ ও মার্চেন্ট ব্যাংক লোকসান দিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা এখন অন্য খাতের আয় এনে এসব সহযোগী প্রতিষ্ঠান পুষতে হচ্ছে।

### ৬. ডেসটিনি

ডেসটিনি এমএলএম পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে। পাশাপাশি ডেসটিনি কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং বেআইনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০2 সালে ডেসটিনির বিরুদ্ধে প্রায় ৪ হাজার ১১৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করার অভিযোগ আনে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং দুটি মামলা করে। দুদক ২০1৪ সালের মে মাসে ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমীনসহ ৫১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। গত বছরের (২০১৫) ১১ জুন আদালত অভিযোগ আমলে নেন। আসামিদের মধ্যে সাতজন কারাগারে আছেন।

### ৭. ওরিয়েন্টাল ব্যাংক

২০০5 সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক থেকে এ ব্যাংকের উদ্যোক্তারা নানা অনিয়ম করে ৫৯৬ কোটি টাকা তুলে নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পরিদর্শনে এ অনিয়ম ধরা পড়লে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসানো হয়। অভিযুক্তদের শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ব্যাংকটির মালিকানায় ছিল ওরিয়ন গ্রুপ। পরে ব্যাংকিং খাতে আস্থা ধরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয়

ব্যাংক ওই ব্যাংকটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। বাইরের একটি শিল্পগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকটি বিক্রি করা হয়। বর্তমানে ব্যাংকটির নাম আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক।

**৮. রপ্তানির নামে আত্মসাৎ**

২০০৫ সালে চট্টগ্রামের অখ্যাত ব্যবসায়ী এম. নুরুন্নবী ভুয়া রপ্তানির নামে ৬৯৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ঘটনাটি জানাজানি হয় ২০০৭ সালে। নুরুন্নবী বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন ব্যাংক শাখা থেকে স্থানীয় ঋণপত্রের (এলসি) স্বীকৃতি (অ্যাকসেপট্যান্স) দিয়ে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ বের করে নেয়। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাঠানো তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দুদক মামলা করে। অর্থাৎ এটি এখন বিচারাধীন (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)।

**৯. মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর টাকা নিয়ে উধাও**

২০০২ সালে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ আগরওয়াল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পালিয়ে যায়। মার্কেন্টাইল, ঢাকা, আইএফআইসি, এনসিসি ও ওয়ান ব্যাংক থেকে এ ঋণ নেয় ওই ব্যক্তি। ওমপ্রকাশের প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তার নামে এ ঋণ নেয়া হয়েছিল। পরে ওই দুই কর্মকর্তা রহস্যজনকভাবে নিহত হন। গত দেড় দশকে ওমপ্রকাশ আগরওয়াল বাংলাদেশে আসেনি। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পাঁচটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চাকরি হারান (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)।

## আরও কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র:

উপরোক্ত নয়টি ছাড়াও বিগত সময়ে ব্যাংকিং খাতে আরও কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটে যেমন:

১. **ঋণ বিতরণে অনিয়ম:** বিগত বছরগুলোতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর অনিয়মের অনেক সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন, ব্যাংকিং নিয়ম লঙ্ঘন করে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৪শ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে নতুন অনুমোদন পাওয়া বেসরকারি খাতের ফারমার্স ব্যাংক। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির ৬টি শাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ পরিদর্শন চালিয়ে ঋণ বিতরণে অনিয়মের প্রমাণ পায়। ব্যাংকের গুলশান করপোরেট, মতিঝিল, ইমামগঞ্জ, চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ, জামালপুরের বকশীগঞ্জ ও শেরপুর শাখায় ৯টি পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হয়। উদ্‌ঘাটিত অনিয়মগুলোর মধ্যে রয়েছে– অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ, অন্য ব্যাংকের খেলাপিঋণ অধিগ্রহণ ও প্রকল্পের জামানত বাজার মূল্যের চেয়েও বেশি দেখানো (*মানবজমিন*, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫)।
   অগ্রণী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা থেকে বহুতল ভবন নির্মাণে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ৩শ কোটি টাকা ঋণ নেয় মুন গ্রুপ। এরপর মুন গ্রুপ থেকে কোনো টাকা ফেরত পায়নি ব্যাংকটি। ২০১৫ সালের আগস্টে মুন গ্রুপের এই প্রকল্পে অগ্রণী ব্যাংকের পাওনা হয় ১৩২ কোটি টাকা। টাকা উদ্ধারের জন্য ভবনসহ জমি বিক্রির চেষ্টা করে অগ্রণী ব্যাংক, কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে পারেনি। এই ঘটনায় অগ্রণী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মিজানুর রহমান খানকে ব্যাংকটির সব ধরনের দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয়া হয় (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬)। এছাড়া মুন গ্রুপ কেলেঙ্কারিসহ ঋণ বিতরণে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকার দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আবদুল হামিদকে অপসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক চিঠি দেয়। কিন্তু তাকে অপসারণ করা যায়নি (*প্রথম আলো*, ১৩ এপ্রিল ২০১৬)।
   ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি ঘটে গুলশান শাখায়। এছাড়া চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ ও ঢাকার দিলকুশা শাখায়ও নানা ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত একটি তদন্তে বড় ধরনের জালিয়াতি ধরা পড়ে। এসব কারণে পরিচালকদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে ব্যাংকের এমডি একেএম শফিকুর রহমান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যদিও তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বলে জানান তিনি (*যুগান্তর*, ০৩ অক্টোবর ২০১৪)।

২. **ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচার:** ০১ জুলাই ২০১৫ *যুগান্তরের* এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যাংকের মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার হচ্ছে। আমদানি মূল্য পরিশোধের পরও পণ্য দেশে না এনে, রফতানির মূল্য বিদেশে রেখে দিয়ে এবং বিদেশে বিভিন্ন ভুয়া কাজের অজুহাতে তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে এসব টাকা পাচার হচ্ছে। এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় ব্যবসায়ী নামধারী একটি সংঘবদ্ধ চক্র এসব টাকা পাচার করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

তদন্তে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ঘটনার সঙ্গে ১২টি ব্যাংকের সম্পৃক্ততা পেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এদিকে পাচার করা টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কয়েকটি ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কয়েকটি ব্যাংকের কাছে এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

৩. **রূপালী ব্যাংক থেকে অর্থ লোপাট:** রূপালী ব্যাংক থেকে বেনিটেক্স লিমিটেড, মাদার টেক্সটাইল মিলস ও মাদারীপুর স্পিনিং মিলস নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে যায় প্রায় হাজার কোটি টাকা। এর ৮০১ কোটি টাকা আদায়ের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (*প্রথম আলো*, ২৭ মার্চ ২০১৬)।

৪. **ব্যাংক ডাকাতি:** কিশোরগঞ্জে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সোনালী ব্যাংকের ভল্ট থেকে প্রায় ১৭ কোটি টাকা চুরির চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। তখন ব্যাংকের ভল্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করতে সব ব্যাংককে নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেই নির্দেশনা ছিল ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। ওই নির্দেশনার পরও থামেনি ব্যাংকের ভল্টের টাকা চুরি। কিশোরগঞ্জের ঘটনার দেড় মাস পর সুড়ঙ্গ কেটে চুরির ঘটনা ঘটে বগুড়ার আদমদীঘিতে। তার কয়েক মাস পর চাঞ্চল্যকর আরেকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে জয়পুরহাটে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে আশুলিয়ায় দিনদুপুরে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় ব্যাংকের ম্যানেজারসহ আটজন নিহত হন। এর কয়েকদিন পরই যশোরে অগ্রণী ব্যাংকের গ্রিল কেটে ভল্ট ভেঙে ২১ লাখ টাকা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

৫. **ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি:** সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংকের তিনটি বুথ থেকে ৩৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় জালিয়াত চক্র।

৬. **এটিএম বুথে জালিয়াতি:** দেশজুড়ে প্রায় ১০ হাজার এটিএম বুথের মাধ্যমে প্রায় ৯০ লাখ গ্রাহক এই সেবা নিচ্ছেন। সম্প্রতি চারটি ব্যাংকের স্থানীয় কার্ড অর্থাৎ এটিএম কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে গ্রাহকের প্রায় ২১ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার তথ্য পায় বাংলাদেশ ব্যাংক। গ্রাহকের অজ্ঞাতসারে একাউন্ট থেকে টাকা তোলা এবং নানা ধরনের ভুতুড়ে ট্রানজেকশনের ঘটনা ঘটার পর এই জালিয়াতির বিষয়টি বেরিয়ে আসে। এরফলে ঝুঁকির মুখে পড়েছে এই সেবা।

**সারণি-১:** বিগত দেড় দশকে ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারির কিছু চিত্র

| নং | নাম | টাকা (কোটি) | সময় (সাল) | মূল অভিযুক্ত | সাজা/মামলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি | ৮০০ | ২০১৬ | চিহ্নিত হয়নি | মামলা হয়েছে |
| ২. | বেসিক ব্যাংক | ৪,৫০০ | ২০১২-২০১৩ | শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু | মামলা নেই |
| ৩. | হলমার্ক ও সোনালী ব্যাংক | ৪,৫০০ | ২০১২ | তানভির মাহমুদ, জেসমিন ইসলাম | সাজা হয়নি, বিচারাধীন |
| ৪. | বিসমিল্লাহ গ্রুপ | ১,১০০ | ২০১১-২০১২ | খাঁজা সোলায়মান | সাজা হয়নি, বিচারাধীন |
| ৫. | পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারি (২০১০) | ১৫,০০০ | ২০১০ | কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি | কিছু মামলা হলেও উল্লেখযোগ্য কারো শাস্তি হয়নি |
| ৬. | ডেসটিনি | ৪,১১৯ | ২০০৬-২০১২ | রফিকুল আমীন | সাজা হয়নি, বিচারাধীন |
| ৭. | ওরিয়েন্টাল ব্যাংক | ৫৯৬ | ২০০৫ | ব্যাংকের উদ্যোক্তারা | বিচারাধীন |
| ৮. | চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী এম নুরুন্নবীর অর্থ আত্মসাৎ | ৬৯৮ | ২০০৫ | এম নুরুন্নবী | বিচারাধীন |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯. | মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ আগরওয়াল-এর অর্থ আত্মসাৎ | ৩০০ | ২০০২ | ওমপ্রকাশ আগরওয়াল | সংশ্লিষ্ট পাঁচটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের চাকরি থেকে অব্যহতি |

**তথ্যসূত্র:** প্রথম আলো, মার্চ ২৭, ২০১৬

## সরকারি ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি

*যায় যায় দিনের* এক প্রতিবেদনে (১৩ মার্চ ২০১৬) বলা হয়, মূলধন ঘাটতিতে রয়েছে ছয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। তাদের বাঁচাতেই আগামী দুই অর্থবছরের বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা দেয়া হবে। এর মধ্যে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা সমান বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। কিন্তু জনগণের করের টাকায় কেন ব্যাংকের মূলধনের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে এমন প্রশ্ন বিশ্লেষকদের। তাঁরা বলছেন, ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রতি অর্থবছরেই করের অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। অনিয়ম করে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা হচ্ছে না, আর সেই দায় পূরণ করছে জনগণ। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্যমতে, গত বছর ডিসেম্বর শেষে মূলধন ঘাটতিতে রয়েছে সরকারি ছয়টি ব্যাংক। এর মধ্যে সবচেয়ে ৬ হাজার ৮১৭ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। এরপর বেসিক ব্যাংকের ১ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা, সোনালী ব্যাংকের ১ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা, জনতা ৪৯ কোটি, রূপালী ব্যাংক ২৪৫ কোটি টাকা ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ৭৮১ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি রয়েছে।

## অনিয়ম ও দুর্নীতির শীর্ষে সোনালী ব্যাংক

অনিয়ম ও দুর্নীতির শীর্ষে উঠে এসেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক। এরফলে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রায়ই ব্যাংকের সাধারণ গ্রাহকরা ভোগান্তিতে পড়েন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গ্রাহকদের অভিযোগের শীর্ষ ১০ ব্যাংকের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সোনালী ব্যাংকের নাম। এ সময়ে সোনালী ব্যাংকের বিরুদ্ধে ২৫৬টি অভিযোগ আসে। এছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসের হিসাবেও দেখা গেছে, অনিয়ম ও দুর্নীতির ভিত্তিতে প্রথম অবস্থানে রয়েছে সোনালী ব্যাংক (*মানবকণ্ঠ*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫)।

## খেলাপি ঋণ

বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর অন্যতম সমস্যা, ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণ (নন পারফরমিং লোন) ৮ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে এসে ১০ দশমিক ৫ শতাংশে উপনীত হয়েছে। খেলাপি ঋণের এ হার ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর এসে বেড়ে ১০ দশমিক ১১ শতাংশ উপনিত হয়েছে। এ ছাড়া খেলাপি ঋণ ও অবলোপণকৃত ঋণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ঋণ আদায়ে এ ব্যর্থতার জন্য ব্যাংকগুলোর অদক্ষতাই দায়ী (*উন্নয়ন অন্বেষণ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ২০১৬)।

## সিএসআর খাতের অর্থ জালিয়াতি:

*যুগান্তরে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে (২৩ অক্টোবর ২০১৪) বলা হয়, ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর খাতে খরচ করা টাকার একটি অংশ নিয়ে জালিয়াতি করা হয়েছে। এসব টাকা সিএসআর নয় এমন খাতের পাশাপাশি খরচ হচ্ছে বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় খাতেও। অনেক ক্ষেত্রে শোভাবর্ধন ও ব্যাংকের নিজস্ব প্রচারের জন্যও খরচ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে অগ্রণী, প্রাইম, মার্কেন্টাইল ও ইসলামী ব্যাংকের সিএসআরের টাকা খরচের ক্ষেত্রে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই জালিয়াতির সঙ্গে ব্যাংকের কিছু অসাধু পরিচালক জড়িয়ে পড়েছেন।

## বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ হ্রাস

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহে প্রতিবছরই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অথচ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না, যা বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত মুদ্রানীতির অকার্যকারিতাকেই প্রমাণ করে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ এর মুদ্রানীতিতে বেরসকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ ধরা হয়েছিল, যার বিপরীতে ১৪ দশমিক ১৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭ দশমিক ৩ ধরা হলেও সাড়ে ৬ শতাংশ অর্জিত হয়েছে (*উন্নয়ন অন্বেষণ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ২০১৬)।

## সুইস ব্যাংকে বেড়েছে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থ

*বিবিসি বাংলার* এক প্রতিবেদনে (১৯ জুন ২০১৫) বলা হয়, সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জমা রাখা অর্থের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানেই প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জমা রাখা অর্থের পরিমাণ ৫০৬ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ, টাকার অঙ্কে প্রায় চার হাজার তিনশত কোটি টাকা। আগের বছর এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৭২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ প্রায় তিন হাজার একশত পঞ্চাশ কোটি টাকা। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ রাখার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা এবং বিনিয়োগের যথাযথ পরিবেশ না থাকায় দেশের বাইরে বিশেষ করে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে রাখা অর্থের পরিমাণ বেড়েছে।

## অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ

অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ২০১৫ সালের নভেম্বরে সরকারি পাঁচ ব্যাংক সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও কৃষি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসায় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৪৯ ধারা অনুযায়ী, এর আগে সরকারি খাতের বেসিক ব্যাংকেও পর্যবেক্ষক বসানো হয়। এছাড়া ওরিয়েন্টাল ব্যাংক থেকে পরিবর্তিত আইসিবি ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও মার্কেন্টাইল ব্যাংকে বসানো হয় পর্যবেক্ষক। সর্বশেষ এ বছরের (২০১৬) জানুয়ারিতে নতুন অনুমোদন পাওয়া ফারমার্স ব্যাংকেও পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (*মানবজমিন*, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫)।

## রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংকের অনুমোদন

২০১১ সালে দেশের ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের সঙ্গে নতুন নয়টি ব্যাংকের অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক এর বিপক্ষে ছিলো। তাদের যুক্তি, এতগুলো ব্যাংক সামলানোর সামর্থ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেই। এমনকি এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদও একমত হতে পারেননি। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যাংকের পরিমাণ বাড়লে বা বেশি ব্যাংক থাকলে মান বজায় থাকে না। সে সময় অর্থমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক।

## রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালক নিয়োগ:

মহাজোট সরকার ২০০৯ সাল থেকেই রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে পরিচালক নিয়োগ দিয়ে আসছে। অথচ রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সদস্য নিয়োগ দেয়া হলে তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ও সন্দেহ তৈরি হয়। আমরা পূর্বে বলেছি যে, গত সাত বছরে বিভিন্ন ব্যাংকে ছোট-বড় অসংখ্য কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। এসব আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় অনেকাংশেই ওই সব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ওপর বর্তায়। কারণ, ব্যাংক খাতের বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া পর্ষদ সদস্যদের নাম আলোচনায় এসেছে। তবে, সম্প্রতি সরকার সেই অবস্থান থেকে সরে এসে দলীয় লোকের বদলে অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও সাবেক ব্যাংকারদের নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, যাকে আমরা স্বাগত জানাই।

## বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর আইটি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন:

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর আইটি সিস্টেম কতটা সুরক্ষিত? নিরাপত্তার জন্য কত অর্থ খরচ করে ব্যাংকগুলো? বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা চুরির পর এ প্রশ্নগুলো অনেকেই তুলছেন। গত ৬ এপ্রিল ২০১৬ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সাইবার ঝুঁকির কথা তুলে ধরে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি সাইবার ঝুঁকি সামলানোর পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) দক্ষতা বাড়াতে সহায়তারও প্রস্তাব দিয়েছে বলেও জানা গেছে।

তথ্য-প্রযুক্তির (আইটি) ব্যবহারে দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলো প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ভেন্ডর বা তৃতীয় পক্ষের ওপর নির্ভরশীল। আরেক হিসাব অনুযায়ী, সাইবার নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো এখন তাদের বাজেটের মাত্র তিন-সাড়ে তিন শতাংশ অর্থ খরচ করে। এ খরচ ১৫-২০ শতাংশ হওয়া উচিত বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। ১৩ মার্চ ২০১৬ *বিবিসি বাংলা*কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, গত ২০ বছরে আইটি খাতে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে ব্যাংকগুলো। কিন্তু এই বিনিয়োগের অন্তত ১৫ শতাংশ খরচ হওয়া উচিত ছিল এই সিস্টেমকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য। কারণ এখন অনলাইন ব্যাংকিং এর যুগ, আন্তর্জাতিক লেনদেন, মোবাইল ব্যাংকিং – সবকিছুতে সাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। মি. রহমানের মতে, এজন্য ব্যাংকগুলোর যে বাজেট থাকে তার ১৫ থেকে ২০ শতাংশই নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত।

## নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যর্থতার চিত্র:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান দুটি কাজ হচ্ছে– ১. স্থিতিশীল মুদ্রানীতি পরিচালনা এবং ২. ব্যাংক খাতের ওপর তদারকি-নজরদারির ভিত্তিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া (যদিও রিজার্ভের কৃতিত্ব অনেকটাই প্রবাসী শ্রমিকদের) উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখাতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

*যুগান্তরে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে (০২ জুলাই ২০১৪) বলা হয়, 'রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে ব্যাংকিং খাতে জাল-জালিয়াতি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ... হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, বেসিক ব্যাংক ও ডেসটিনির কেলেঙ্কারি – এসব কেলেঙ্কারি ... রোধে এবং প্রকৃত অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকটাই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।'

*যুগান্তরের* প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক বিভাগে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, হলমার্কের জালিয়াতির আগে সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার স্বাভাবিক ছিল। ওই সময়ের তুলনায় ২০১১ সালে শাখার ঋণ প্রবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে প্রায় ৬৯৬ শতাংশে দাঁড়ায়। যখন সবেমাত্র হলমার্কের কেলেঙ্কারির শুরু। ওই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ওই শাখায় একটি ব্যাপক তদন্ত করা হয়। ওই সময়ে রূপসী বাংলা শাখায় জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সোনালী ব্যাংককে একটি চিঠি দিয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের দায়িত্ব শেষ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো তদারকি না থাকায় জালিয়াতি আরও শাখা বিস্তার করে এটি দেশের ২৭টি ব্যাংকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকেও রূপসী বাংলা শাখায় বিপুল পরিমাণে নগদ অর্থের জোগান দিয়ে আসছে। ওই সময়ে ব্যাংকটি প্রতিদিন গড়ে কলমানি থেকে শত কোটি টাকা ধার করত। যে ব্যাংকটি সব সময় কলমানিতে ধার দেয়, সে ব্যাংকটি নিয়মিতভাবে কলমানি থেকে ধার নিচ্ছে, এটা জানার পরেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক হাত গুটিয়ে থাকে। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা বাজারের সূচকগুলো বিশ্লেষণ করলেই টাকার প্রবাহ কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা করেনি। এ নিয়ে সোনালী ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ে পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হয়। বাজারেও চাউর হয়ে যায় রূপসী বাংলা শাখার জালিয়াতির ঘটনা। সোনালী ব্যাংকও আর্থিক সংকটে অন্য ব্যাংকের দায় শোধ করতে পারছিল না। তখন ২০১৩ সালের মার্চে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে বেরিয়ে আসে বড় ধরনের জালিয়াতির ঘটনা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যদি ২০১১ সালেই সোনালী ব্যাংকের ওই শাখায় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিত তাহলে হয়তো জালিয়াতির অংক হাজার কোটি টাকার নিচে থাকত। ওই ঘটনা তদন্ত করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে ছেড়ে দেয়। এত বড় একটি জালিয়াতি এবং টেকনিক্যাল বিষয়, যা সহজে দুদকের পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন। তারপরেও দুদক রাজনৈতিক প্রভাবে ব্যাংকের পরিচালকদের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়। অথচ ব্যাংক পরিচালনার নীতি প্রণয়ন করে পর্ষদ। পর্ষদ হলমার্কের নামে ঋণের অনুমোদনও দিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক হলমার্কের জালিয়াতির ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। এর নেপথ্যে কারা রয়েছে অথবা টাকা কোথায় গেছে- এসব ব্যাপারে কোনো তদন্ত করেনি।

একই ঘটনা ঘটেছে বেসিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও। ১৯ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন সরকার বেসিক ব্যাংকে রাজনৈতিক পছন্দের চেয়ারম্যান নিয়োগ করে, তখনই এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওই সময়ে কিছুই করেনি। কেননা ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ব্যাংকগুলোর পর্ষদের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুপারিশ করবে তা অর্থ মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই মতামত দিয়েছে ২০১৪ সালের মাসের শেষ দিকে। যেটি আরও চার বছর আগে দিলে হয়তো এমনটি হতো না। নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের পর থেকে বেসিক ব্যাংকে সব ধরনের নিয়ম-কানুন উল্টে যায়। চালু হয় চেয়ারম্যানের নামে নতুন শাসন। এই পর্যায়ে ব্যাংকের প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ঋণ বিতরণে কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করা হয়নি। যখন যেমন ইচ্ছে তেমন করে ঋণ নেয়া হয়েছে। বেসিক ব্যাংকের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি হয়েছে গুলশান শাখায়। ওই শাখায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১১ সালেই তদন্ত করে জালিয়াতির ঘটনা শনাক্ত করে। কিন্তু জোরালো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ২০১২ সালের তদন্তে আরও ব্যাপক জালিয়াতির ঘটনা বেরিয়ে আসে। ওই সময়েও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২০১৩ সালের শেষ দিকে যখন বিষয়টি গণমাধ্যমে চলে আসে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেসিকের ব্যাপারে নড়েচড়ে বসে।

বিসমিল্লাহ গ্রুপের চারটি ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করা টাকার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত করেও জোরালো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তারা প্রায় সব টাকাই পাচার করে দিয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত তারাও বিদেশে চলে গেছে।

ডেসটিনি গ্রুপ গ্রাহকদের বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিষয়ে শুধুমাত্র তদন্ত করে ওই প্রতিবেদন দুদককে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে। এর আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে ইসলামিক ট্রেড অ্যান্ড কমার্স লিমিটেডের (আইটিসিএল) বেআইনি ব্যাংকিং ব্যবসা প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপরও একই ধরনের ব্যবসা চালায় যুবক এবং ডেসটিনি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে এবং বেআইনি ব্যাংকিং কার্যক্রম চালায়। বেআইনি ব্যাংকিং ঠেকানো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব হলেও এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

এছাড়া পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থতার পরিচয় দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উৎপাদনশীল খাতে ঋণ দানের পরিবর্তে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন পুঁজিবাজার নির্ভর হয়ে পড়ে এবং এ প্রবণতা বেড়েই চলছিল, তা রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক শক্ত পদক্ষেপ নেয়নি। সর্বশেষ ২০১০ সালে পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কমাতে তড়িৎ এবং দফায় দফায় নির্দেশনা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ বাজার থেকে তুলে নিতে শুরু করে, যা বাজারের ধ্বসকে ত্বরান্বিত করে। দফায় দফায় পলিসি পরিবর্তন করার কারণে বাজারে যে ধ্বস নেমে আসে তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককেই দায়ী করেন শেয়ারবাজারের অনেক বিনিয়োগকারী।

## বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অনিয়ম

২৭ মার্চ ২০১৬ *প্রথম আলো*কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ব্যাপক সংস্কার দরকার। এর ব্যবস্থাপনা অদক্ষ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিচতলায় যে লেনদেন হয়, তার মুনাফার কোনো হিসাব থাকে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের লোকেরা ভাগ করে নিয়ে যান। তাঁর মতে, বাংলাদেশ ব্যাংক হবে নির্জন জায়গা। অথচ এখন তা

বিরাট বাজার। নিচতলায় বিরাট কামরায় সরাসরি বাণিজ্যিক কার্যক্রম হচ্ছে; যা আগে করত সোনালী ব্যাংক। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য হলো, ব্যবস্থাপনার সংকটের ফলেই এমনটা ঘটছে।

## বাস্তবায়িত হয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংস্কার কর্মসূচি

দু বছর আগে (২০১৪ সালে) আর্থিক খাতের দুর্নীতি রোধ ও শৃঙ্খলা ফেরাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে জরুরি সংস্কারের সুপারিশ করেছিল অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি। এই সংস্কারের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মনিটরিংয়ের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়ার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় সংসদের কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জবাবদিহি করার বিধানও রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সুপারিশই বাস্তবায়ন করা হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, সংসদীয় কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনা হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়ত, বাড়ত স্বচ্ছতাও। জাতীয় সংসদের কাছেও বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতো।

উল্লিখিত সংস্কারের ব্যাপারে সংসদীয় কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে মতামত জানতে চায়। বাংলাদেশ ব্যাংক অধিকাংশ সুপারিশের বিষয়েই ইতিবাচক মত দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়নি। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্তিশালী করতে আরও দু'দফা বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ও ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেষ পর্যন্ত ওই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেনি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শক্তিশালী আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট তৈরিসহ সার্বিক কার্যক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশে উল্লেখ করা হয়, আর্থিক খাতের শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণ রেগুলেটরি ক্ষমতা দিতে হবে। এই ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক খাতে দুর্নীতি ও জালিয়াতি রোধ করবে এই সংস্থা। পাশাপাশি আরও বলা হয়, এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সুপারিশে আরও বলা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ রেগুলেটরি ক্ষমতা না থাকায় সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারে না। ফলে অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরোধ অমান্য করে চলছে। এতে আর্থিক খাতে বিশৃংখলা বেশি তৈরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে জবাবদিহি করছে (*যুগান্তর*, ২০ মার্চ ২০১৬)।

## অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে অন্য দেশের উদাহরণ:

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ নেই বাংলাদেশে। কিন্তু অন্য দেশে নজিরবিহীন শাস্তি দেয়ার উদাহরণ রয়েছে। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাসদাকের সাবেক চেয়ারম্যান বার্নার্ড মেডফের শেয়ারবাজারে আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস হয়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০০৯ সালের জুন মাসে বিচারে ৭১ বয়সী এ ব্যবসায়ীকে ১৫০ বছর জেল দেয়ার পাশাপাশি ১৭০ বিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়।

## অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়:

দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যাংকিং খাত। তাই অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করে এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের নিম্নোক্ত করণীয় রয়েছে বলে আমরা মনে করি:

### ব্যাংকিং কমিশন গঠন:

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এরই মধ্যে ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। এখন প্রয়োজন এ খাতের সঞ্চয়ন, সুষ্ঠু

নীতিমালা ও প্রবৃদ্ধির ধারা নির্ধারণ। ব্যাংকিং খাতের প্রচলিত কার্যক্রম এবং খাতটির সার্বিক অবস্থান মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে একটি কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা রয়েছে আমাদের।' অর্থমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর অর্থ মন্ত্রণালয় এ নিয়ে কাজও শুরু করে।

এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ কাউকে কমিশন প্রধানের দায়িত্ব দিলে এ থেকে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে মনে করেন অনেকে। কমিশনকে সহায়তা করার জন্য দেশি-বিদেশি ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে বলেও মত তাদের। তবে সর্বশেষ ৩ এপ্রিল ২০১৬ সচিবালয়ে দেয়া এক বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ব্যাংকিং খাতে অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেগুলোর ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। এসব তদন্ত শেষে দেখা যাবে ব্যাংকিং খাতে কমিশন করার প্রয়োজনীতা আছে বা থাকবে কিনা (*যুগান্তর*, ৪ এপ্রিল ২০১৬)।

**কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা:** ২৭ মার্চ ২০১৬ *প্রথম আলো*কে দেয়া সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ব্যাপক সংস্কার দরকার। এর ব্যবস্থাপনা অদক্ষ। এ অবস্থায় আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ন রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জবাবদিহি, দক্ষতা ও নজরদারি কী করে আরও শক্তিশালী করা যায়, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

ব্যাংক ব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসনের কবল থেকে উদ্ধার করে একক রেগুলেটরি বডি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া দরকার। আমরা দেখেছি যে, হলমার্ক কেলেঙ্কারি প্রথম উদ্ঘাটিত হওয়ার পর করণীয় নির্ধারণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিয়েছিল। অর্থাৎ দুর্ঘটনার দায় কেউ নিতে চায় না। কিন্তু একক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দায় এড়ানোর সুযোগ থাকে না।

আরেকটি বিষয় হলো– বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি ব্যাংকগুলোর অডিট রিপোর্ট পেয়ে থাকে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংককে সরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালককে অপসারণের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। শুধু বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান-পরিচালককে অপসারণের ক্ষমতা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের। একই দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের জন্য দুই ধরনের আইন থাকা অনুচিত। ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংশোধন করে প্রাইভেট ও সরকারি ব্যাংককে সমপর্যায়ে আনা দরকার।

**বেসরকারি ব্যাংকে সুশাসন:** ব্যাংক পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের হলেও, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাইভেট ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীসহ পুরো পর্ষদ অপসারণ করতে পারে, প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে এবং অন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, সে কারণে বেসরকারি ব্যাংকের বিপর্যয়ের দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর বর্তায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ব্যাংক সুপারভিশন' বিভাগের কর্মকর্তাদের সততা ও দক্ষতার এতটুকু ঘাটতি হলেই বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগের সংস্কার অপরিহার্য। এই বিভাগের পরিদর্শক থেকে ডেপুটি গভর্নর পর্যন্ত প্রতিটি কর্মকর্তাকে সন্দেহাতীতভাবে সৎ হতে হবে, সাহসী হতে হবে, দক্ষ হতে হবে এবং তাদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

**ব্যাংকিং খাতের জালিয়াতি বন্ধে করণীয়:** ব্যাংকিং খাতের জালিয়াতি বন্ধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যারা অপরাধী, তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শুধু বিভাগীয় শাস্তি হিসেবে বরখাস্ত, বদলি নয়; অপরাধের দায়ের শাস্তি দিতে হবে। এ ছাড়া সৎ, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সঠিক জায়গায় বসাতে হবে। এছাড়া কমপ্লায়েন্স ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, ই-গভর্ন্যান্সকে শক্তিশালী করা দরকার। বিশেষ করে হ্যাকিং রোধে ব্যাংকের বাইরের ঝুঁকি ছাড়াও অভ্যন্তরীণভাবে যাতে হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটতে না পারে সেদিকেও নজরদারি বাড়ানো দরকার। দরকার ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তথ্যভাণ্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

**আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট:** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন, পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উধর্ক্ষতন ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জবাবদিহির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সক্রিয়তা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া ঋণ বিতরণের আগে ব্যাংকের স্বার্থেই ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ খাতে সম্ভাব্যতা যাচাই, ঋণের সুদ ব্যবহারকরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ ও সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষা করা দরকার। দরকার ঋণের ঝুঁকি নির্ণয় ও এর নিয়ন্ত্রণে করণীয় নির্ধারণ করা।

**ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা:** ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ মুক্ত করা দরকার। রাজনীতিবিদদের মনে রাখা দরকার, ব্যাংকের মতো একটি প্রযুক্তিনির্ভর খাতকে সবসময় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা উচিত, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব প্রয়োজন।

**পরিচালক নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠন:** সরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, বোর্ড সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের জন্য সরকার একটি উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করতে পারে। যাদেরকে মানুষ সৎ ও যোগ্য মনে করে এমন ব্যক্তিরাই হবেন এ কমিটির সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, সাবেক অর্থসচিব ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হতে পারেন এই কমিটির সদস্য। সার্চ কমিটি একটি পদের জন্য দুই জনের নাম সুপারিশ করবে। সরকার একজনকে নিয়োগ দেবে। উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনে সরকারের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে এই প্রক্রিয়া সহায়ক হতে পারে। সেই সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধন আনা প্রয়োজন।

**তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনগুলো বাস্তবায়ন করা:** অতীতে বিভিন্ন কেলেঙ্কারির পর সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদনে (যেমন, পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারির ঘটনা তদন্তে ঘটিত কমিটি) বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ করলেও সেগুলোর সার্বিক বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই আমরা মনে করি, দেরিতে হলেও বিভিন্ন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার।

**খেলাপি ঋণ রোধে ট্রাইব্যুনাল গঠন:**
ব্যাংক ঋণ খেলাপিকে দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য অর্থঋণ আদালতের পাশাপাশি একটি 'খেলাপি ঋণ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ব্যাংকের শীর্ষ দশ ঋণখেলাপিকে চিহ্নিত করা এবং পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে।

**ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা:** ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় ট্রেড ইউনিয়ন। কারণ তারা বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। তাই ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক মূল দলের অঙ্গ সংগঠন বিবেচনা করা যাবে না।

**সৎ-নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা:** কিছু সৎ-নিষ্ঠাবান ব্যাংক কর্মকর্তা অনিয়ম-জালিয়াতি রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, যার কারণে তারা নানা রকম হয়রানির শিকার হন। এ অবস্থায় তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে পুরস্কৃত করে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে।

**সচেতনতা বৃদ্ধি করা:**
তথ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় ব্যাংক, গ্রাহক ও নিয়ন্ত্রক সবার সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা-সম্পর্কিত ঝুঁকির বিষয়ে সচেতন থাকেন না। এ বিষয়ে তাদেরও সচেতনতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা দরকার।

**আরও কিছু করণীয়:**

১. গ্রাহক-সংক্রান্ত Know Your Customer (KYC) পরিপূর্ণ যাচাইকরণ-পূর্বক গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা, ধরন ও অবস্থান নির্ধারণ;

২. ঋণ-প্রস্তাব এবং অনুমোদনে কোনো প্রকার প্রভাব না খাটানো;

৩. যথাযথভাবে অনুমোদিত ঋণ কেবল ঋণ-সংক্রান্ত যাবতীয় জামানত এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদির যথার্থতা যাচাইকরণ এবং সম্পাদনের পরই অর্থ প্রদান এবং গ্রাহকের মূলধন বিনিয়োগের সামর্থ্য যাচাইকরণ;

৪. গ্রাহকের ঋণগ্রহণের সঠিক কারণ; cash flow এর সঙ্গে সঙ্গতিকরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা;

৫. ঋণের প্রদেয় অর্থ মুনাফাসহ সঠিক সময়ে ফেরত নিয়ে আসার তাগিদে উপযুক্ত তদারকি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭. আর্থিক বিধি-বিধানগুলো অনুসরণ করা; সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় যেসব আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপন নীতিমালা জারি করে সেসব মেনে চলা;

৮. মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিরাপদ করা;

৯. টাকা পাচার রোধে যেসব সংস্থা টাকা পাচার করছে তাদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে হবে।

১০. ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথে মতবিনিময় করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

---

* **২১ এপ্রিল ২০১৬, জাতীয় প্রেসক্লাবে, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত গোলটেবিলে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত**